ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

সারসংক্ষেপ

০১ নভেম্বর ২০২৬

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

কাওসার আহমেদ, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

কাজী আমিনুল হাসান, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

সাদিয়া আফরিন কণা, *গবেষণা সহকারী, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

ফাতিমা তানজিম, *গবেষণা সহকারী, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম লেভেল)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২;
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১
গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ১
গবেষণার পরিধি ২
গবেষণা পদ্ধতি ২
গবেষণার ফলাফল ৩
রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো ৩
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আইনি চ্যালেঞ্জ ৩
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আর্থিক চ্যালেঞ্জ ৪
রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সম্পর্কিত বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক চর্চা ৪
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা ৪
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব ৫
রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনি চ্যালেঞ্জ ৫
রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা ৬
রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপালন ৬
রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ ৬
রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানের উপস্থিতি ৬
রাজনৈতিক দলের সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন এবং বিদেশে সংগঠন বা শাখা পরিচালনা ৭
অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা ৭
দলীয় প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া: গঠনতন্ত্র অনুসরণ ও বাস্তব চর্চা ৭
রাজনৈতিক দলে পরিবার-কেন্দ্রিক নেতৃত্ব নির্বাচনের চর্চা ৮
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল ৮
রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ৮
রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় কমিটি গঠন ৮
রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ৮
নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া ৯
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি ৯
দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি ৯
নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন ১০
জবাবদিহি ব্যবস্থা ১০
জাতীয় সম্মেলন (কাউন্সিল/পার্টি কংগ্রেস/মজলিসে শুরা) আয়োজন ১০
দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ১১
তথ্য প্রকাশ ১২
রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ১২
রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ১২
দলীয় আর্থিক নীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি ১২
ঘোষিত আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত ১২
হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ১৩
রাজনৈতিক দলসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অনিয়ম ১৩
রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয় ১৩
রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাক্কলিত আয় ১৪
রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া ১৪
অনিয়ম-দুর্নীতি ১৫
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ ১৫
সার্বিক পর্যবেক্ষণ ১৫
সুপারিশ ১৬

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

রাজনৈতিক দল হলো এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, যারা কিছু অভিন্ন আদর্শ, নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সেই নীতি বা কর্মসূচিগুলো কার্যকর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে (সার্তোরি, ১৯৭৬; হেউড, ২০১৯)। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও কার্যকর করতে রাজনৈতিক দলসমূহ প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং দলগুলোর মাধ্যমে নাগরিকগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থান ও রাজনৈতিক দলভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। পাকিস্তান আমলে ভাষার অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান ও বিধিবিধান পরিবর্তন, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের বিকাশ, রাজনৈতিক অধিকার ও চর্চা বারবার বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্বাচন ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব করা হয় এবং সেই সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে জুলাই জাতীয় সনদে এ বিষয়ে সকল দলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৯টি হলেও ২০০৮ সাল থেকে মোট ৬৩টি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ৩টি দলের নিবন্ধন বাতিল ও একটি দলের নিবন্ধন স্থগিত করা হয়। তবে নিবন্ধিত দলগুলোর বাইরে বাংলাদেশে কতগুলো অনিবন্ধিত দল আছে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই। ২০২৫ সালে ১৪৩টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও ১৩৯ টি দল নিবন্ধন পেতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া, কিছু অঞ্চলভিত্তিক সক্রিয় রাজনৈতিক দল রয়েছে যাদের কার্যক্রম দুই-তিনটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২-৫০টি দল অংশ নিলেও জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে ২০টি দল। মতাদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধানত তিনটি ধরন লক্ষ করা যায়–জাতীয়তাবাদী বা মধ্যপন্থী মতাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং ধর্মীয় মতাদর্শ। এই মতাদর্শগত বিভাজন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি, সাংগঠনিক কাঠামো, রাজনৈতিক অবস্থান এবং রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে থাকে।

প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং সেই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা অত্যাবশ্যক। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহিংসতা, দলীয় অন্তর্কোন্দল, নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, আর্থিক অনিয়ম ও অস্বচ্ছতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হলেও দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিষয়ে নিবিড় গবেষণায় ঘাটতি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিশেষ করে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, নেতৃত্ব নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রার্থী মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির চর্চা মূল্যায়নের মাধ্যমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তরণের পথ চিহ্নিত করা বাংলাদেশের সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ।

সেইসাথে সুশাসন, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে টিআইবির নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

১. রাজনৈতিক দল পরিচালনা সম্পর্কিত আইনি কাঠামো ও এর পরিপালন পর্যালোচনা করা
২. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা পর্যালোচনা করা
৩. রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পর্যালোচনা করা
৪. দলীয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ পর্যালোচনা করা
৫. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় ২০০৮ সাল থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক বিষয়সমূহ এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া, দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব নির্বাচন, বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন, দলীয় মনোনয়ন প্রদান, জবাবদিহি ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার চর্চা ইত্যাদি। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে গবেষণার বিবেচ্য কাল হিসেবে ধরা হয়েছে, তবে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ক্ষেত্রবিশেষে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ের কিছু হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় ৪২টি রাজনৈতিক দলের (৩৭টি নিবন্ধিত ও ৫টি অনিবন্ধিত) সাথে যোগাযোগ করা হলেও ৩২টি রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ তথ্য প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত/মনোনীত (দলকে প্রতিনিধিত্বকারী) কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট এবং মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে কেআইআই চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে গবেষণার নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি তথ্যদাতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত বিস্তারিতভাবে জানা যায়। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রামান্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বা দফতর থেকে সংগৃহীত দলের গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও তথ্য, পূর্বে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন ও একাডেমিক নথি, প্রাসঙ্গিক বই, জার্নাল প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

সারণি: তথ্যের ধরনভেদে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	রাজনৈতিক নেতা-কর্মী: প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত/মনোনীত (দলকে প্রতিনিধিত্বকারী) কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক
পরোক্ষ তথ্য	অনুসন্ধান ও সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও দফতর থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও গবেষণা প্রবন্ধ, পুস্তক

তথ্য সংগ্রহের সময়: জুন ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং জুন ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ: গবেষণায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের তথ্য প্রদানে সময়ক্ষেপণ, অসহযোগিতা ও আংশিক তথ্য প্রদান করেছে। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১০টি রাজনৈতিক দলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ইতিবাচক সাড়া প্রদান না করা বা সাক্ষাৎকার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়।

গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো: এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিবন্ধন প্রক্রিয়া, দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব নির্বাচন, বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন, দলীয় মনোনয়ন প্রদান, জবাবদিহি ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার চর্চা ইত্যাদি সুশাসনের পাঁচটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশকসমূহ হলো- আইনি কাঠামো, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার ফলাফল

রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিককে সংগঠন বা সমিতি করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রাখে। তবে রাজনৈতিক দল গঠন ও এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৮ সালে 'দ্য পলিটিক্যাল পার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে দল গঠন করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাবিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন; বিদেশি-সহায়তাপুষ্ট রাজনৈতিক দল গঠন; গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সশস্ত্র ক্যাডারভিত্তিক দল গঠনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা। এছাড়া এই অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের তহবিলকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ে আসা হয়। তবে এই অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা বিশেষত অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, প্রার্থী মনোনয়ন, নারীর প্রতিনিধিত্ব, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, বা জবাবদিহি নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পরবর্তীতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনগত শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা; কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যোগ্য হবে তার একটি সুস্পষ্ট কাঠামো নির্ধারণ করা; রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যকরতা যাচাই করা; অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা; নেতৃত্ব নির্বাচন ও প্রার্থী মনোনয়নের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা; দলীয় কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা; সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতির পরিপন্থী, বৈষম্যমূলক বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী দলকে নিবন্ধনের আওতার বাইরে রাখা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে নিবন্ধন প্রদান, তথ্য যাচাই, ধারাবাহিক তদারকি এবং প্রয়োজনবোধে নিবন্ধন বাতিলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন-এর নিয়ন্ত্রক ভূমিকার জন্য একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে ২০০৮ সালে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২'-এর সংশোধন এবং 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮' প্রণয়ন করা হয়। তবে আরপিও, ১৯৭২ এবং বিধিমালা ২০০৮-এ বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আইনি চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আগ্রহী হলে আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ধারা ৯০(খ)(১)(ক)-এ মূলত দুই ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়। পূর্বের কোনো নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট সফলতা অর্জন বা সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকার শর্ত পূরণসাপেক্ষে দলগুলোকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- "বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসন লাভ করতে হবে।"
- "উপরোক্ত সংসদ নির্বাচনের যে কোনো একটিতে উক্ত দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভ করতে হবে।"
- কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় অফিস, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্যূন এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর জেলা অফিস এবং অন্যূন একশতটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন থানায় অফিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাহার প্রত্যেকটিতে সদস্য হিসাবে ন্যূনতম দুইশত ভোটারের তালিকাভুক্তি করতে হবে।"

নিবন্ধন শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্বাচনী সাফল্য সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রথম শর্ত দুইটি কেবল ২০০৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০০৮ সালের পরের গঠিত নতুন দলগুলোর পক্ষে যেহেতু নিবন্ধন ছাড়া নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয় সেহেতু আইনের এই শর্ত নতুন দলের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নতুন দলগুলোর জন্য কঠোর ও জটিল সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ক তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পর্যায়, এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলা ও একশটি উপজেলা পর্যায়ে অফিস থাকা এবং প্রতিটি পর্যায়ে দুইশত ভোটার থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০০৮ সালের পূর্বে নির্বাচনে জাতীয় সংসদের একটি আসনে বিজয়ী হওয়া বা যে কোনো একটি আসনের মোট ভোটের পাঁচ শতাংশ ভোট পাওয়া দলগুলোর এই সংখ্যক কার্যালয় বা ভোটার না থাকলেও তারা নিবন্ধন পেয়েছে। আইনের এই শর্ত নতুন করে গঠিত দলের জন্য বৈষম্যমূলক এবং একই সঙ্গে এই শর্ত দলগুলোর ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে। সেইসাথে শর্তটি নতুন দলগুলোকে পরোক্ষভাবে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা এবং রাজনৈতিক অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। অন্যদিকে এই সাগঠনিক কাঠামো নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দলগুলোর ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী গোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়াও বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয়ে অনেক সময় নতুন দলগুলো নতুন কোনো এলাকায় দলীয় কার্যালয় স্থাপন ও স্বাভাবিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের কর্মী-সমর্থকরা তাদের কর্মী পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে এবং পরিচয় গোপন করে যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের দলীয় কার্যক্রম ও ভোটার যাচাই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা বিলম্বিত করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে আর্থিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিবন্ধন সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ক শর্ত পূরণে বড় অঙ্কের আর্থিক ব্যয়। নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো ও ভৌগলিক বিস্তৃতি সংক্রান্ত আইনি শর্তাবলি পূরণ করা দলগুলোর জন্য বড় ধরনের আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যা একই সাথে রাজনীতি এবং জাতীয় নির্বাচনে 'এন্ট্রি ব্যারিয়ার' সৃষ্টি করছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী, আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পাওয়ার শর্তাবলি পূরণ করতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় দলিল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম খরচ বাবদ ন্যূনতম ৩৩ লাখ টাকা থেকে ৭৬ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন ও উদীয়মান দলগুলোর জন্য শুরুতেই এত বিপুল অঙ্কের অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। ফলে নিবন্ধনের এই আইনি শর্ত নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

ফলে নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর আইনি শর্ত পূরণের এই বিপুল ব্যয় সংকুলান করতে শুরুতেই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয় এবং দলের ওপর বিত্তশালীদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শের তোয়াক্কা না করে কেবল অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে, গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করা ও সাজাপ্রাপ্ত একটি ব্যবসায়িক গ্রুপের কর্ণধার মাত্র দুই-তিন মাসের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং নির্বাচন কমিশন থেকে এই দলের প্রাথমিক নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদিও পরবর্তীতে নানা বিতর্ক, গণআন্দোলন এবং প্রবল আপত্তির মুখে নির্বাচন কমিশন সেই নিবন্ধন প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এমন ঘটনা বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে আর্থিক সক্ষমতা নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় যে সুবিধা সৃষ্টি করে তার একটি দৃষ্টান্ত। উল্লিখিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আইনি শর্তভিত্তিক বর্তমান ব্যবস্থাটি অর্থনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক মক্কেলবাদ (competitive clientelism) তৈরি করছে।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সম্পর্কিত বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক চর্চা

রাজনৈতিক দলের আইনী স্বীকৃতি ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে স্বকীয় আইনি কাঠামো ও শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী তিনটি দেশ এবং উপমহাদেশের বাইরে একটি দেশের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় কঠোর ও ব্যয়বহুল। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত দলের গঠনতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিতি হলেও বাংলাদেশে বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো বা পূর্ববর্তী জাতীয় নির্বাচনে দলের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের আইনী কাঠামো অনুযায়ী, একটি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত হতে হলে দলের নিজস্ব গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি, দলে ন্যূনতম ১০০ জন সদস্য এবং একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকতে হয়। এছাড়া দল গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলি আরো বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট; সেখানে দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার দাখিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তত একজন নারী সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ উপস্থাপন করা শ্রীলঙ্কায় নিবন্ধনের প্রধান শর্ত হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশ নেপালে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনে সামাজিক সংহতি ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে–দলের এমন কোনো নাম, প্রতীক বা পতাকা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এর পাশাপাশি নেপালের এসংশ্লিষ্ট আইনে নিয়মিতভাবে কমিটি নির্বাচনের বিধানসংবলিত একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা, ঘোষণাপত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যালয় স্থাপন এবং সুস্পষ্ট তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রদর্শন করার বিধান রয়েছে। নিবন্ধন লাভের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উক্ত দলের ১০,০০০ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার শর্তও সেখানে কার্যকর রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আইনী পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ ও মৌলিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল; যেখানে মূলত দলের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় অফিস এবং একটি অনুমোদিত দলীয় গঠনতন্ত্র থাকাই নিবন্ধনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি শর্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক কঠোর এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা নির্ভর নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাচনী সক্ষমতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও নতুন দলের বিকাশের সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২-এর ধারা ৯০ঙ(২)-এ "কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত নাকচ করা হইলে, পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে, কমিশন উহা, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট দলকে অবহিত করিবে", এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলেও দরখাস্ত নাকচ করার সুনির্দিষ্ট কারণ লিখিতভাবে জানানোর কোনো স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা আইনে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত দলগুলোর মধ্যে থেকে বাতিল হওয়া দলগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করলেও, দলগুলোর নিবন্ধন আবেদন বাতিল করার কারণ উল্লেখ করে না। ফলে গোটা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না, যা সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সকল অংশীজনের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব

কয়েকটি দলের নিবন্ধন প্রদানে সরকারি হস্তক্ষেপ ও দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ওঠে। একাধিক তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপে কিছু রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও কয়েকটি দল দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক জটিলতা কিংবা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছে এবং পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে নিবন্ধন লাভ করেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আইনি অস্পষ্টতার কারণে এই সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যালয়, সাংগঠনিক কাঠামো এবং নিবন্ধনের অন্যান্য শর্ত সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, যদিও এসব অভিযোগের প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণ দুরূহ। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের একজন তথ্যদাতা উল্লেখ করেন যে-

> *"কিছু ক্ষেত্রে (নিবন্ধন সংক্রান্ত) আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তবে সেটা 'নাস্তা' পর্যায়ে নাকি 'ট্রেডিং (নিবন্ধন বাণিজ্য)' সেটা নিশ্চিত না।"*

সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হলেও এর বাস্তবায়নে অনিয়ম, অস্বচ্ছতা, অনানুষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ বিদ্যমান। আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০জজ(১)(অ)-এ বলা হয়েছে- "নির্বাচন কমিশন কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন স্থগিত করিতে পারিবে এবং তাহার জন্য সংরক্ষিত প্রতীক অব্যবহার্য রাখিতে পারিবে, যতক্ষণ না উহা প্রত্যাহার করা হয়, যদি– সরকার কর্তৃক উক্ত দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত করা হয়।" আইনের এই ধারা দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার ওপর প্রত্যক্ষ সরকারি বা নির্বাহী হস্তক্ষেপের একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকায় নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সংকুচিত হয়। উপরন্তু, সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা স্থগিত করার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উক্ত দলের নিবন্ধন বাতিল কিংবা স্থগিতকরণের এই ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিপক্ষ দলকে দমন বা তাদেরকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার হাতিয়ার হিসেবে এই আইনের অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'দ্য পলিটিক্যাল পার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮'-এ আইন লঙ্ঘনের কারণে কোনো রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলের বক্তব্য যাচাই সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান থাকলেও আরপিও, ১৯৭২ -এ সরাসরি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোনো দলের নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনি চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদান গ্রহণ ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরপিও, ১৯৭২-এ কয়েকটি মৌলিক বিধান নির্ধারণ করা রয়েছে। আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০চ(১)(ক) ধারাতে ৫০ হাজার টাকার অধিক অনুদান ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা এবং দাতার আয়কর রিটার্নে তা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলেও অনুদানের মূল উৎস রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশ করা কিংবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই করার কোনো স্পষ্ট বিধান রাখা হয়নি। এছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান–যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান–থেকে অনুদান গ্রহণ করা যাবে কিনা সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি। ফলে, অনুদান গ্রহণে বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকা দলের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরির ঝুঁকি সুযোগ রয়েছে। সেইসাথে অনুদান প্রদানে প্রকৃত মালিকানা (বেনিফিসিয়াল ওউনারশিপ) প্রকাশ বা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন নামে একাধিক অনুদান গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আরপিও'তে, যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্র, বিদেশি অনুদানপুষ্ট এনজিও বা বিদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে রাজনৈতিক দলের অনুদান বা উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরপিও, ১৯৭২-এর ধারা ৯০চ(২) বলা হয়েছে-

> *"কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোনো সংস্থার নিকট হইতে কোনো উপহার, দান, অনুদান বা অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না"।*

এই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃতপক্ষে বিদেশি উৎস থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে বা ভিন্ন উপায়ে কোনো আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করছে কি না, তা যাচাই করার কোনো বিধান নেই, যা দলগুলোকে বিদেশি উৎস থেকে গোপনে অনুদান গ্রহণের সুযোগ তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এ রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কিছু আইনি ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উক্ত বিধিমালার বিধি ৬(চ)-এ "দলের নামে রক্ষিত ব্যাংক-একাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম এবং উক্ত একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি" সংক্রান্ত তথ্য দলের নিবন্ধনের আবেদনের সাথে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও, দলের সব পর্যায়ের প্রতিটি লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়ে বিধিমালাতে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। পাশাপাশি, ডিজিটাল অর্থ লেনদেনের মাধ্যম, যেমন মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস)-এর মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদন করার বিষয়ে কোনো বিধানও এই বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আংশিক/সীমিত লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। দলের মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি স্তরে বিপুল পরিমাণের অনানুষ্ঠানিক ও নগদ অর্থ লেনদেনের সুযোগ তৈরি হয়, যা রাজনৈতিক অর্থায়নের অস্বচ্ছ ও অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের পরিবেশকে উৎসাহিত করছে।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৯(খ)-এ "প্রতি বৎসর ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের পঞ্জিকা বৎসরের সংশ্লিষ্ট দলের আর্থিক লেনদেন একটি রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা অডিট করাইয়া অডিট রিপোর্টের একটি কপি কমিশনে দাখিল" বাধ্যতামূলক করা হলেও বিধিমালাতে দলের সকল পর্যায়ের (যেমন জেলা, উপজেলা বা তৃণমূল পর্যায়) আর্থিক লেনদেনের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং কমিশনে জমা দেওয়ার সুস্পষ্ট আইনি বিধান নেই। সেইসাথে, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দল কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যথাসময়ে ও নিয়মিত দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও, জমাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিরপেক্ষভাবে 'যাচাই' বা জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য আকারে জনসমক্ষে 'প্রকাশ' করার সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলো সর্বস্তরের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে তাদের দাখিলকৃত আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে না, যা দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় নির্বাচন কমিশনও রাজনৈতিক দলগুলোর জমাকৃত আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ স্বাধীনভাবে যাচাই করে না, বা সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে এগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে না।

রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপালন

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে ঘাটতি লক্ষণীয়। আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ) ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ অনুযায়ী, নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট বিধানসহ দলীয় গঠনতন্ত্র থাকা বাধ্যতামূলক। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি রাজনৈতিক দলই তাদের দলের গঠনতন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করলেও এর মধ্যে চারটি দল -আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) -এর সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা গঠনতন্ত্র সরবরাহ করেনি।

এছাড়াও আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(ক) ও রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো দলের একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকা। তবে মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, চারটি দল প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিবর্তে দলের শীর্ষ নেতাদের ব্যক্তিগত বাসভবন বা ব্যবসায়িক চেম্বারকে দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছে। এই দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বিকল্পধারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি (অনিবন্ধিত)।

রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানের উপস্থিতি

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০গ(১)-এ বলা হয়েছে, "এই অধ্যায়ের অধীন কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে, যদি- (ক) উহার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সংবিধানের পরিপন্থী হয়; বা (খ) উহার গঠনতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য প্রতীয়মান হয়"। কিন্তু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে ২৮টি দলের (যে দলগুলো গঠনতন্ত্র সরবরাহ করেছে) গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭টি রাজনৈতিক দলের (জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল, এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টি) গঠনতন্ত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন, একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি সকল নাগরিকের বিশ্বাস স্থাপন বা একমত পোষণ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা; মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা; বিদ্যমান নিয়ম-নীতিকে প্রত্যাখ্যান, প্রচলিত 'অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে' ইসলাম ধর্মের আলোকে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ (সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; মূলনীতিসমূহ – জাতীয়তাবাদ; ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা; ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য; ইত্যাদি)-এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক। দলগুলোর গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা, সদস্যপদ প্রদান এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি

হিসেবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধানের 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ', 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' ও 'ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য না করা' নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

রাজনৈতিক দলের সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন এবং বিদেশে সংগঠন বা শাখা পরিচালনা

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ)(ই) অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল তাদের গঠনতন্ত্রে শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক কিংবা আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যেকোনো পেশার সদস্যদের নিয়ে গঠিত সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন রাখতে পারবে না। তবে বাস্তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে এবিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও প্রায় সকল নিবন্ধিত দল, বিশেষ করে বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলো, 'সহযোগী' বা 'ভ্রাতৃপ্রতিম' সংগঠনের নামে ছাত্র, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে পৃথক সংগঠন সরাসরি পরিচালনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'সহযোগী' বা 'ভ্রাতৃপ্রতিম' ছাত্র সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেইসাথে আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০গ(১)(ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে রাজনৈতিক দলের কোনো কার্যালয়, শাখা বা কমিটি গঠন ও পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দেশের অন্যতম বৃহৎ দুইটি রাজনৈতিক দলের (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি এবং বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) গঠনতন্ত্রে বিদেশের মাটিতে দলীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নীতি মেনে সংগঠন ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এছাড়াও গঠনতন্ত্রে সরাসরি উল্লেখ না থাকলের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্তত ৬টি রাজনৈতিক দলের (জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় নাগরিক পার্টি) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে দলীয় শাখা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পরিচালনার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে।

অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা

দলীয় প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া: গঠনতন্ত্র অনুসরণ ও বাস্তব চর্চা

রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুণগতমান নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং দলীয় নেতৃত্বকে তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে দলীয় গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নেতৃত্ব নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান এবং বাস্তব চর্চার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় কাউন্সিলে ভোটের মাধ্যমে দলীয় প্রধান নির্বাচনের বিধান বিদ্যমান। তবে, বাস্তবে এই নির্বাচন অধিকাংশ সময় গোপন ব্যালটের পরিবর্তে কণ্ঠভোটের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। এর ফলে ভোটদান প্রক্রিয়া স্বাধীন ও গোপন থাকার পরিবর্তে দৃশ্যমান ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, যা সদস্যদের স্বতন্ত্র মতপ্রকাশকে নিরুৎসাহিত করে। গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতির অনুপস্থিতির ফলে দলের ভেতর এক ব্যক্তির নিরুঙ্কুশ কর্তৃত্বের চর্চা লক্ষণীয় যা দলের মধ্যে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ হ্রাস করে।

অন্যদিকে, মনোনয়ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে গঠনতান্ত্রিক ও বাস্তব চর্চার ব্যবধান আরও প্রকট। রাজনৈতিক দলগুলোতে বিশেষত বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে, একজনের বেশি প্রার্থীর মনোনয়নের নজির প্রায় অনুপস্থিত। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কমউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) দলীয় প্রধান নির্বাচনে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।

গবেষণায় রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিধান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রেই একজন ব্যক্তি কতবার বা কত মেয়াদে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে একই ব্যক্তির নেতৃত্বে দল পরিচালিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। নিয়মিত নেতৃত্ব পরিবর্তনের চর্চার অনুপস্থিতি দলীয় জবাবদিহি ও ক্ষমতার চক্রাকার পরিবর্তন বাধাগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করে। একই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি দলে প্রধান নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পারিবারিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। পারিবারিক বিবেচনায় নেতৃত্ব নির্বাচনের কারণে দলীয় প্রধান নির্বাচনে প্রতিযোগিতা, উন্মুক্ততা এবং যোগ্যতাভিত্তিক অগ্রগতির সুযোগ সংকুচিত হয় এবং দলীয় কাঠামো ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচনের যোগ্যতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে শীর্ষ নেতৃত্বের পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, দলীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা বা নেতৃত্বের পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো সুস্পষ্ট শর্ত উল্লেখ নেই। ফলে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সাংগঠনিক অবদানের পরিবর্তে পারিবারিক পরিচয়, আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক প্রভাব বা ব্যক্তিগত তারকাখ্যাতির মতো বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলে পরিবার-কেন্দ্রিক নেতৃত্ব নির্বাচনের চর্চা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রধান নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার অনুপস্থিতি রয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দশটি রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব পারিবারিক বিবেচনায় একই পরিবারের ভেতর স্থানান্তরিত হয়েছে, যেমন-পিতা/মাতা থেকে সন্তান, ভাই থেকে ভাই ও স্বামী থেকে স্ত্রীর হাতে। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবার-কেন্দ্রিকতার সবচেয়ে প্রচলিত রূপ দেখা যায় পিতা/মাতা-সন্তান সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে। পারিবারিক বিবেচনায় নেতৃত্বের পরিবর্তন কোনো উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা বা সদস্যভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চর্চা দেখানো হলেও বাস্তবে দলীয় প্রতিযোগিতা ও বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশের পথ সংকুচিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে পরিবারভিত্তিক নেতৃত্ব গ্রহণের প্রবণতার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে একই ব্যক্তির দলীয় নেতৃত্ব প্রদান বা নেতৃত্ব ধরে রাখার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় প্রধানের নেতৃত্বের মেয়াদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কমপক্ষে বারটি রাজনৈতিক দলের প্রধান এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধানের যথাক্রমে ৪১ ও ৪৫ বছর ধরে নেতৃত্ব প্রদান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির দলীয় প্রধান পরিবর্তন হয়েছে। এই চর্চা সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করলেও সময়ের পরিক্রমায় মূলত অতিমাত্রায় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়, বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশের সম্ভাবনা সংকুচিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে।

রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সব রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তিনটি দল-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এবং খেলাফত মজলিসের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সুনির্দিভাবে উল্লেখ নেই। তবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও খেলাফত মজলিসের ক্ষেত্রে আমিরে মজলিসের মেয়াদ দুই বছর নির্ধারিত থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে পৃথক কোনো বিধানের উল্লেখ নেই। গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি সংক্রান্ত এই ধরনের অস্পষ্টতা মূলত কেন্দ্রীয় কমিটির নবায়ন, নেতৃত্বের জবাবদিহি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে দুর্বল করে। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ও পুনর্গঠন বিষয়ে অনিশ্চয়তার সুযোগ থাকার কারণে দলীয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও নিয়মতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদের উল্লেখ না থাকার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সর্ম্পকে উল্লেখ নেই। গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা ২৮টি দলের মধ্যে ১৯টি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ তিন বছর, তিনটি দলের চার বছর, দুটি দলের পাঁচ বছর এবং একটি দলের দুই বছর নির্ধারিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২৪টি দলের ক্ষেত্রে জাতীয় কাউন্সিল, পার্টি কংগ্রেস বা মজলিসে শূরার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তিনটি দলের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্য বা সাধারণ পরিষদের গোপন ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান পাওয়া যায়। তবে একটি দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ ও গঠনপ্রক্রিয়া গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এ বিধানসমূহের কার্যকর প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় কমিটি গঠন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও গঠনপ্রক্রিয়া উল্লেখ রয়েছে। গবেষণায় ২৮টি দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ১১টি দলের স্থানীয় কমিটির মেয়াদ দুই বছর, ১০টি দলের তিন বছর, একটি দলের এক বছর এবং তিনটি দলের ক্ষেত্রে পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় কমিটি বহাল থাকার বিধান রয়েছে। তবে দুইটি দলের (নাগরিক ঐক্য ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন) স্থানীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। স্থানীয় কমিটি গঠনের পদ্ধতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের সদস্যদের মাধ্যমে স্থানীয় কমিটি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তবে একটি দলের (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) স্থানীয় কমিটির গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা নিয়মাবলী নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় কমিটি গঠনের জন্য অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো বিদ্যমান। তবে কিছু দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ না করা ও কমিটি গঠনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের সাংগঠনিক স্বায়ত্তশাসন ও অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চাকে সীমিত করা রয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দলীয় সুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক উপাদান। রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কাঠামো, ক্ষমতার বণ্টন এবং চর্চা বিশ্লেষণ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, জবাবদিহি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার

জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, মনোনয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় কমিটিসহ একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিধান রয়েছে। দলীয় গঠনতন্ত্রে জাতীয় কাউন্সিলকে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমেই দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন, নেতৃত্ব নির্বাচন, আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। একইভাবে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং বিভিন্ন স্তরের কমিটি অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে স্থানীয় কমিটিগুলো স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক সম্প্রসারণ এবং সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৬টি রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিল নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সভা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য নীতিনির্ধারণী কাঠামো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হলেও বাস্তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রায়ই শীর্ষ নেতৃত্ব বা দলীয় প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটিগুলোর ভূমিকা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চেয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব ও নেতৃত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, জেলা, উপজেলা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটিগুলো মূলত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাংগঠনিক বিস্তারে ভূমিকা পালন করে। নীতি প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত।

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া

গবেষণায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও এ প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের মতামত ও অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৯০(১)(খ) (ঈ)-এ জাতীয় নির্বাচনে দল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির প্রস্তাবিত প্রার্থীদের প্যানেল বিবেচনার কথা বলা হলেও বাস্তবে অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নে স্থানীয় পর্যায়ের মতামত গুরুত্ব পায় না। বরং প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তেই নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনীত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য কোনো সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মানদণ্ড উল্লেখ নেই। ছয়টি দলের গঠনতন্ত্রে মনোনয়ন দেওয়ার শর্ত হিসেবে "যোগ্যতা", "জনপ্রিয়তা", "সততা", "দলের প্রতি আনুগত্য" ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হলেও এসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। ফলে প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক ও পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের পরিবর্তে নেতৃত্বের বিবেচনায় মনোনয়ন দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা বা স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি দলীয় প্রধানের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যকে গুরুত্বপূর্ণ 'মানদণ্ড' হিসেবে দেখা হয়। একই সঙ্গে বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নে অর্থ ও পেশিশক্তি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিকে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলো থেকে ব্যবসায়ী প্রার্থী ও ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যের উল্লেখযোগ্য হার লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোতে নির্বাচনী প্রার্থী মনোনয়নে প্রার্থীর অর্থ-প্রতিপত্তি ও ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রভাবশালী তিনটি দলে (বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি) নির্বাচনী প্রার্থী বাছাইয়ে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগও বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়। প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের অংশগ্রহণের সাংগঠনিক কাঠামো থাকলেও তাদের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। সরাসরি মনোনয়ন বোর্ডের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর এই চর্চা মূলত দলের অভ্যন্তরে স্থানীয় সংগঠন ও সদস্যদের মতামত প্রতিফলনের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে এবং প্রার্থী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নেতৃত্বকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আসনে প্রার্থীর দলের প্রতি অবদান, জনস্পৃক্ততা, রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বা নির্বাচনী সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যকে অনেক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষত বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থ ও পেশিশক্তি গুরুত্ব পাওয়ার কারণে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সমতা, স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয় না। অন্যদিকে, ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২- এর ধারা ১২(১)(ঞ) সংশোধনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম তিন বছর দলের সক্রিয় সদস্য থাকার শর্ত বাতিল করা হয়। এর ফলে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের দলীয় সম্পৃক্ততা বা সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাধ্যতামূলক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে।

অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি

দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি

আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৯০খ(১)(খ) অনুযায়ী, নিবন্ধিত ও নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলোর সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩শতাংশ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংশ্লিষ্ট দলের নারী সদস্যদের

প্রতিনিধিত্ব বিশ্লেষণ করলে আইনের এই ধারা পরিপালনে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪টি রাজনৈতিক দল (বাংলাদেশ লেবার পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি, ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ) তাদের সংশ্লিষ্ট গঠনতন্ত্রে আরপিও-র এই বিধান অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ নারীদের দলীয় সদস্যপদ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রাই নির্ধারণ করেনি। অপর দুইটি রাজনৈতিক দলের (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) গঠনতন্ত্রে এই সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজনও নারী সদস্য নেই। এছাড়াও একটি দলের (খেলাফত মজলিস) কেন্দ্রীয় কমিটিতে সকল পুরুষ সদস্যের নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হলেও ৩৭ জন নারী সদস্যের মধ্যে শুধু দুইজন সদস্যের নাম প্রকাশ করা এবং বাকিদের ক্ষেত্রে কেবল '৩৫ জন নারী সদস্য' রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে জাকের পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাত্র একজন নারী কর্মীকে পাঁচটি ভিন্ন পদে তালিকাভুক্ত করে পাঁচবার গণনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরপিও-র নির্ধারিত ৩৩ শতাংশ বা তার অধিক নারীদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দল এই লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে পেরেছে। অন্যদিকে ২১ থেকে ৩২ শতাংশ নারী সদস্যের উপস্থিতি রয়েছে মাত্র একটি দলে এবং ১১ থেকে ২ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে ১২ টি দল। নয়টি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যের উপস্থিতি অতি নগণ্য–মাত্র ১ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ৬টি রাজনৈতিক দল তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত কোনো তথ্যই প্রকাশ করেনি।

নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন

জাতীয় সংসদে নারীরা সাধারণত সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ ও সংরক্ষিত নারী আসনে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে এক ধরণের অনীহা ও কাঠামোগত অন্তরায় লক্ষ্যনীয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই সরাসরি নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন দিতে অনাগ্রহী এবং মনোনয়ন না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে দলগুলো "যোগ্য নারী প্রার্থীর অভাব" ও "নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে কম আগ্রহী" বলে দাবি করেছে। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন ব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সুযোগের অভাবই নারীদের সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের পরিসংখ্যানগত চিত্র বিশ্লেষণ করলেও নারীদের সরাসরি মনোনয়নের হতাশাজনক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন সামগ্রিকভাবে ৫ শতাংশেরও কম ছিল।

বিশেষভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলো অন্তত পাঁচ শতাংশ (৫%) নারী প্রার্থী মনোনয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সেই নীতিগত অঙ্গীকার পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ১৩টি রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রার্থী তালিকায় একজনও নারী প্রার্থী ছিলেন না। অন্যদিকে আরও ১২টি দল নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও তাদের মনোনীত প্রার্থীর মোট হারের মাত্র ৩.১ শতাংশ ছিল নারী। পক্ষান্তরে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীর হার ছিল ৭.৯ শতাংশ। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের দলের প্রতি অবদান, মেধা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, তোষণনীতি, পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোনয়ন মূলত জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বকে প্রকাশ করে। দলীয় মনোনয়ন ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর এই বৈষম্যমূলক ও অনীহাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে নারীদের সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে অন্তর্ভুক্ত করার সদিচ্ছা দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় এখনও অনুপস্থিত।

জবাবদিহি ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক বৈধতা, গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে, দলীয় নেতৃত্ব, গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিধিবিধান অনুসারে ক্ষমতার প্রয়োগ, দলীয় সদস্যদের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির আওতায় থাকবে। ফলে, জবাবদিহি কার্যক্রম দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় সম্মেলন (কাউন্সিল/পার্টি কংগ্রেস/মজলিসে শুরা) আয়োজন

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় কাউন্সিল বা জাতীয় দলীয় সম্মেলন, পার্টি কংগ্রেস বা মজলিসে শুরা সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন, গঠনতন্ত্র সংশোধন, সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানানো এবং গ্রহণ করা হয়। গবেষণায় বিশ্লেষিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো, কমিটির স্তরবিন্যাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিক বিধানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ দলেই বাস্তব রাজনৈতিক অনুশীলনে ক্ষমতার উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীয়ভূত, ব্যক্তিনির্ভর নেতৃত্ব, অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত চরিত্র নির্ধারণ করে। এর ফলে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার পরিবর্তে প্রতীকী বা বৈধতা প্রদানকারী

কাঠামো হিসেবে কাজ করে। সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১৬টি দলের নিয়মিত সম্মেলন আয়োজন করে না। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করেনি। ফলে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জবাবদিহি, সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে গঠনতান্ত্রিক নিয়মের ব্যতয়ের মাধ্যমে চর্চিত হচ্ছে। এছাড়া, সম্প্রতি নিবন্ধনপ্রাপ্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন অর্জনের পরেও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়নি। একইভাবে জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে গঠনতন্ত্রে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাস্তবে এসব ইউনিটের কার্যপরিধি প্রধানত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তৃণমূল পর্যায় থেকে নীতিগত মতামত বা সাংগঠনিক সুপারিশ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সীমিত।

দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান হলো দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক সংহতি বজায় রাখা, গঠনতন্ত্র ও দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং দলীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল তাদের গঠনতন্ত্রে শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য সতর্কীকরণ, কারণ দর্শানোর নোটিশ, সাময়িক বরখাস্ত, দলীয় পদ থেকে অপসারণ, সদস্যপদ স্থগিত এবং বহিষ্কারের মতো ব্যবস্থা রাখার বিধান রয়েছে। তবে এসব বিধানের ভাষা, শৃঙ্খলা ভঙ্গের সংজ্ঞা এবং শাস্তির মাত্রা নির্ধারণের মানদণ্ডের মধ্যে দলভেদে পার্থক্য রয়েছে। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে 'দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড', 'দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য', 'দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা', 'দলীয় নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কার্যক্রম' কিংবা 'শৃঙ্খলা ভঙ্গ'-এর মতো তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কোন ধরণের আচরণ কোন মাত্রায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য কোন ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা হয়নি। অন্যদিকে কোনো দলেরই নেতা-কর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র আচরণবিধি নেই।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক দলে সদস্য ও কর্মীদের অভিযোগ জানানো বা প্রতিকার চাওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলেও দলীয় নেতা-কর্মীদের কর্মকাণ্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ জানানো ও বিচারপ্রাপ্তির কোনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে ও চর্চায় অনুপস্থিত। ফলে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলে সুস্পষ্ট আচরণবিধি, কার্যকর নৈতিক মানদণ্ড এবং জবাবদিহিতামূলক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার নিকটবর্তী দলগুলোর নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, হত্যা, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়ম-দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ব্যবসা, সেক্সটরশন ইত্যাদি অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আর্দশিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার পরিবর্তে দলীয় কর্তৃত্বের ব্যবহার অনানুষ্ঠানিক উপায়ে ব্যবহৃত হয়ে সমাজে দলীয় প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণায় পর্যালোচিত উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মোট ২,৩৫৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের এই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে গত তেরো বছর আট মাসে ২৭,৮৬০ জন আহত এবং ৪২৮ জন নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা বছরই অনুয়ায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি বছরই দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০২৫ সালে সংঘর্ষের ঘটনা, আহত ও নিহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতি সংঘাতে এই চিত্র মূলত অভ্যন্তরীণ দলীয় প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার লড়াই দলীয় শৃঙ্খলা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বিদ্যমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিরোধ সংঘাতপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে এবং তা সহিংসতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তঃদলীয় সহিংসতার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০২৬ (আগস্ট পর্যন্ত) সময়ে মোট ১,৯২৬টি সংঘর্ষের ঘটনায় ১৮,৪৯১ জন আহত এবং ৩১৮ জন নিহত হয়েছেন। এ সময়কালে সংঘর্ষের মাত্রা বছরভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের সময়ে সহিংসতার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ৫০২টি সংঘর্ষ, ২,৩৭৮ জন আহত এবং ১০৯ জন নিহত হওয়ার ঘটনা সংঘর্ষিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করে। একইভাবে ২০২৪ সালে সরকার পতন পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২৭০টি সংঘর্ষ, ২,৩৫২ জন আহত এবং ৩৮ জন নিহত হয়েছে। অন্তঃদলীয় রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতা প্রকাশ পায় ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র আট মাসেই ২৪৮টি সংঘর্ষ, ১,৯৯৬ জন আহত এবং ২০ জন নিহত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংতায় মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, এনসিপি'র সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই রাজনৈতিক সহিংসতা রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃগোষ্ঠীগত প্রতিযোগিতার তীব্রতার ইঙ্গিত বহন করে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০২৬)। তবে গবেষণায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের মানদণ্ডের অস্পষ্টতা, একই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভিন্ন শাস্তি, শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, অভিযোগ ও শুনানি প্রক্রিয়ার সীমিত স্বচ্ছতা এবং দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিন্নমত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি। পাশাপাশি,

অন্তঃদলীয় এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার আহরণ করার সম্ভাব্য রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

তথ্য প্রকাশ

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় সুশাসন নিশ্চিতে জনগণ ও অংশীজনদের কাছে দলের কার্যক্রম ও আর্থিক তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের চিত্র পর্যালোচনা করলে ব্যাপক স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৪টি দলের ওয়েবসাইট থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১৬টি দলের ওয়েবসাইট সক্রিয় রয়েছে, অর্থাৎ অবশিষ্ট দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বা স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য কার্যকর ডিজিটাল উপস্থিতি সীমিত। এমনকি যেসব দলের ওয়েবসাইট সক্রিয় রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় আওতাভূক্ত সক্রিয় থাকা ১৬টি রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইট বিশ্লেষণ করলে তথ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী স্বচ্ছতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫টি দল যোগাযোগের ঠিকানা ও নম্বর প্রকাশ করেছে এবং ১৩টি দল কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে দলের মূল দলিল বা গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেছে মাত্র ৯টি দল এবং নির্বাচনী ইশতেহার উন্মুক্ত রেখেছে ৭টি দল। মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আরও সংকুচিত; স্থানীয় কমিটি সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে মাত্র ৩টি দলের এবং মাত্র ১টি দল তাদের কর্মীদের সংখ্যার হিসাব ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছে। রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আচরণবিধি এবং জবাবদিহি সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দলগুলোর অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব, দলের অভ্যন্তরীণ আচরণবিধি কিংবা দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না। সেইসাথে, আরপিও, ১৯৭২ এর ধারা ৪৪গগ(১) অনুযায়ী, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনকালীন আয়-ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণায় কোনো দল সংশ্লিষ্ট আয়-ব্যয়ের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না।

রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মিত আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। ফলে রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থায়নের উৎস, ব্যয় পরিচালনা এবং আর্থিক জবাবদিহি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূলত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনি কাঠামো ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, অনুদান দাতার পরিচয় প্রকাশ, নির্বাচনী ব্যয় এবং দলীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ করে।

দলীয় আর্থিক নীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো দলেরই পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র আর্থিক নীতিমালা বা আর্থিক কার্যপ্রণালী বিধি নেই। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে কেবল আয় ও ব্যয়ের উৎসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও অর্থ সংগ্রহ, ব্যয় অনুমোদন, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি কাঠামো সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত লিখিত নীতিমালা অনুপস্থিতির কারণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং আর্থিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে না এবং তাদের গঠনতন্ত্রে বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত করেনি। প্রায় সকল দল আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক কৌশল বা পূর্বনির্ধারিত বাজেটের পরিবর্তে দলীয় সভা, সম্মেলন, কর্মসূচি, আন্দোলন বা নির্বাচনী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ে করে থাকে। ফলে আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়মতান্ত্রিক এবং ধারাবাহিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে কর্মসূচিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ রয়েছে।

ঘোষিত আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত

রাজনৈতিক দলগুলোর আয়ের প্রধান ঘোষিত উৎস হলো সদস্য চাঁদা, অনুদান এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থ। অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে সদস্যদের মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতি, হিসাব সংরক্ষণ এবং তদারকি ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনার উল্লেখ নেই। তবে দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হলো দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী বা শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে অনুদান সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও অনুদানের উৎস, গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড, সীমা বা স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের বিধান স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। ফলে

দলীয় অর্থায়নের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তি-নির্ভর উৎসের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এয়াড়া রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় দলের মনোনয়নপত্র বিক্রির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এর পাশাপাশি দলগুলো গণচাঁদা বা ক্রাউডফান্ডিং, প্রকাশনা বিক্রয় এবং দলীয় সম্পত্তি বা বিনিয়োগ থেকে আয়ের মাধ্যমে দলীয় তহবিল গঠন করে। দলীয় ভবন, অফিস, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন কিংবা অন্যান্য সম্পদ থেকে ভাড়া, মুনাফা বা সুদের মাধ্যমে আয় করার সুযোগও কয়েকটি দলের গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে, দলগুলোর আয়ের উৎস মূলত সদস্য চাঁদা ও অনুদাননির্ভর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন কৌশল অনুপস্থিত।

রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যয় প্রধানত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। দলীয় ব্যয়ের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় বিশেষ করে দলীয় কার্যালয়ের ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, স্টেশনারি, যোগাযোগ ব্যয়, প্রকাশনা এবং নিরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় অর্ন্তভুক্ত। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সভা, সম্মেলন, কাউন্সিল, জনসভা, রাজনৈতিক সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দিবস পালনের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করা হয়। রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন এবং সমর্থকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এসব ব্যয় নিয়মিতভাবে প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ব্যয়ের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে নির্বাচনীকালীন ব্যয়। প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচারণা, জনসংযোগ কার্যক্রম, নির্বাচনী সভা, প্রচারসামগ্রী প্রস্তুত এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক সমন্বয় কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করা হয়। যদিও অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে নির্বাচনকালীন ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত বিধান নেই। এর পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, জরুরি সহায়তা এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্যও অর্থ ব্যয়ে করে থাকে। তবে এসব ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।

হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

রাজনৈতিক দলের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষা পরিচালনা এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি অপরিহার্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম। বাংলাদেশের সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতিবছর দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও সকল দল এই বিধান নিয়মিতভাবে অনুসরণ করে না। সেইসাথে দলের সকল আয়-ব্যয় স্বাধীন নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ দলের অর্থের বিনিময়ে নামমাত্র নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনগুলো সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়। কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের আর্থিক প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে না এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও প্রতিবেদনগুলো নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। ফলে দলগুলোর অর্থায়নের প্রকৃত উৎস, ব্যয়ের ধরণ এবং আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের অবগত হওয়ার সুযোগ সীমিত। রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সীমিত পরিসরে আবদ্ধ থাকায় কার্যকর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হওয়া সুযোগ নেই।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত চারটি রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৫ সালে চারটি দলের সর্বনিম্ন আয় ১ কোটি ৮২ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় প্রায় ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২৩ কোটি ৯১ লাখ টাকা। যদিও দলগুলোর গণমাধ্যমে প্রকাশিত আয়-ব্যয় দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি, সাংগঠনিক বিস্তার এবং নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যয়ে বিবেচনা করলে প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তুলনায় অতি নগন্য।

রাজনৈতিক দলসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অনিয়ম

আইন অনুযায়ী প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বাধীন নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষি করে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক দলগুলো আইনের এই বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করলেও কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে দলগুলোর প্রকৃত আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয়ের উৎস কিংবা ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় না; বরং অর্থেও বিনিময়ে নামমাত্র বা মনগড়া আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে সাংগঠনিকভাবে নতুন বা ছোট রাজনৈতিক দলগুলো অনেক ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদ জমাদানের ক্ষেত্রে সাধারণত ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না এবং দলীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও অপ্রকাশিত আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

যেহেতু রাজনৈতিক দলের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তথ্য পাওয়া যায় না, সেহেতু একটি দলের আয়-ব্যয়ের প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করতে দলগুলোর প্রকাশিত আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি দল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য ব্যয়ের খাত ও অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, বরং স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম,

প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা করতে হয়। গবেষণায় বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দলীয় কার্যালয় পরিচালনা ব্যয় এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে একটি রাজনৈতিক দল ব্যাপ্তি বিবেচনায় একটি দলের বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে ২২টি জেলা এবং ১০১টি উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক উপস্থিতি থাকতে হয়। এই ন্যূনতম সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য কার্যালয় পরিচালনা, সভা-সমাবেশ আয়োজন, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম বাবদ একটি দলের সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৪ থেকে ২৫ কোটি টাকা। এই হিসাব কেবলমাত্র ন্যূনতম সাংগঠনিক উপস্থিতি ও মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়কে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বড় আকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি, নির্বাচনকালীন কার্যক্রম অথবা বিশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নয়। যেসব রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনা করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তৃণমূলভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখতে বার্ষিক প্রায় ৩০২ থেকে ৩৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের ব্যয়ের মধ্যে স্থানীয় কার্যালয় এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার তথা সভা-সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণা এবং নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক উপস্থিতি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর্থিক প্রয়োজনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। যদি কোনো রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা, ইউনিয়ন বা পৌরসভা ছাড়িয়ে ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সক্রিয় সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনার জন্য বছরে প্রায় ১,৫৩২ থেকে ২,১৮৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের ব্যয় দলীয় কার্যালয় পরিচালনা, স্থানীয় সংগঠনের সভা, কর্মী সমন্বয়, রাজনৈতিক কার্যক্রম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক তদারকির মতো ন্যূনতম প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাক্কলিত আয়

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তাদের আর্থিক বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে না এবং যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়, সেগুলোও সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা একটি দুরূহ বিষয়। একই সাথে অনুদান, মনোনয়ন ফি, তহবিল সংগ্রহ, সম্পদ থেকে আয় এবং অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যের স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে দলগুলোর প্রকৃত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে দলীয় গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সদস্যসংখ্যা এবং সদস্য চাঁদার ন্যূনতম হার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্ভাব্য ন্যূনতম আয় সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের গঠনতন্ত্রে প্রতিটি সাংগঠনিক পর্যায়ে নির্বাহী ও সাধারণ সদস্যদের ন্যূনতম সংখ্যা এবং তাদের প্রদেয় চাঁদার হার উল্লেখ রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র সদস্য চাঁদাকে বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্ভাব্য ন্যূনতম বার্ষিক আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই হিসাবের মধ্যে অনুদান, মনোনয়ন ফি, বিশেষ অর্থসংগ্রহ কার্যক্রম, ব্যবসায়িক আয় কিংবা দলীয় সম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে এই প্রাক্কলন একটি দলের সার্বিক মোট আয়ের হিসেব নয়।

নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক দলের কমপক্ষে ২২টি জেলা এবং ১০১টি উপজেলা পর্যায়ে সংগঠন থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট স্তরসমূহে গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে হিসাব করলে একটি দলের সম্ভাব্য ন্যূনতম বার্ষিক সদস্য-চাঁদা থেকে আয় প্রায় ২৬ লাখ টাকা হতে পারে। এই পরিমাণ অর্থ একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মৌলিক সদস্যভিত্তিক আর্থিক সক্ষমতার নির্দেশনা দিলেও এটি দল পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। ফলে নিবন্ধিত একটি রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র সদস্য চাঁদার ওপর নির্ভর করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যেসব রাজনৈতিক দল জেলা, মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনা করে, তাদের ক্ষেত্রে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সদস্য চাঁদা থেকেও আয় বৃদ্ধি পায়। গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী, এই ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ তৃণমূলভিত্তিক সংগঠনের বার্ষিক সদস্য-চাঁদা থেকে আয় প্রায় ৩৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, যেসব রাজনৈতিক দল ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম বিস্তার করেছে, তাদের সদস্যসংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। গবেষণার হিসাব অনুসারে, গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ও চাঁদার হার কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে একটি ওয়ার্ডভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র সদস্যদের চাঁদা থেকেই বছরে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা আয় করতে পারে। এই প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে ধারণা করা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক স্থায়িত্ব মূলত সদস্যভিত্তিক অর্থায়নের পরিবর্তে বিকল্প অর্থায়ন উৎসের ওপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন, সম্ভাব্য সাংগঠনিক ব্যয় এবং সদস্য-চাঁদা থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য আয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রাজনৈতিক অর্থায়নের প্রকৃতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি।

রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশিত আয় এবং কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলগুলো আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান পূরণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, যা দলের আর্থিক প্রতিবেদনে দলীয় আয়-ব্যয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি, রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যালয় পরিচালনা, সভা-সমাবেশের আয়োজন, কর্মীদের যাতায়াত ব্যয় এবং অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রমের অর্থ অধিকাংশ

ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থায়নের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ফলে এসব অর্থের একটি বড় অংশ দলীয় হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। বিশেষত ক্ষমতায় থাকা অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাসহ বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন বা ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা পেতে বড় অংকের চাঁদা বা অনুদান প্রদান করে। কিছু কিছু দল তৃণমূল পর্যায়ে গণচাঁদা সংগ্রহ বা ক্রাউড ফান্ডিং এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিপুল আর্থিক চাহিদা এবং স্বচ্ছ অর্থায়ন কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। সাংগঠনিক ব্যয়ের তুলনায় আনুষ্ঠানিক আয়ের উৎস সীমিত কারণে দলগুলো বিকল্প এবং প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎসের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছে। রাজনৈতিক দলের বিপুল পরিমাণ অর্থের চাহিদা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং একইসাথে ব্যক্তি নির্ভরতার কারণে দলের মধ্যে 'প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্ক তৈরি।

অনিয়ম-দুর্নীতি

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৮টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, সচ্চরিত্র, স্বচ্ছতা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও কার্যকর মানদণ্ডের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে, অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ, নেতৃত্বস্থানীয় দলীয় পদ পাওয়া, বা নির্বাচনী মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক বিস্তার, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রায়শই অর্থ ও পেশি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী, চাঁদাবাজ, চোরাচালানকারী, মানব পাচারকারী, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈধতা অর্জন করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বেশি। রাজনৈতিক দলসমূহে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমানভাবে নীতি ও আদর্শভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সম্পদ, পৃষ্ঠপোষকতামূলক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধায়নের এই প্রবণতার সবচাইতে বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নির্বাচনের সময়ে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৮ থেকে ৩২ শতাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে সম্পৃক্ততার অভিযোগে এক বা একাধিক মামলা ছিল।

ক্ষমতায় থাকা বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান লঙ্ঘন করলেও দলগুলোর গঠনতন্ত্রে এবিষয়ে কোনো কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের সুস্পষ্ট বিধান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই। দল মনোনীত কিছু প্রার্থীর নির্বাচনী হলফনামায় সম্পদ, ঋণ, ব্যবসায়িক স্বার্থ বা বিদেশি নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা বা ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করলেও দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। সেইসাথে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিকল্পনা, অর্থের উৎস, ব্যয় তদারকি এবং আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিতি রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্ধারিত ব্যয় সীমার চাইতে প্রার্থীদের গড়ে ১৬৯.৫% অধিক ব্যয় করা হলেও দল থেকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের ৬৭ জন সদস্যের নিজের ও ৪৪ জনের পরিবারের সদস্যদের পাঁচ বছরে ৫০%-এর অধিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ একজন সংসদ সদস্যের ও তার পরিবারের সদস্যের যথাক্রমে ৫,৪৭০% এবং ৩৮,৪২৩%-এর অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নেতা-কর্মীরা সম্পদ অর্জন করলেও দল থেকে দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে লঘু দণ্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশক তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক চর্চা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ঘাটতি লক্ষ করা যায়। একই সাথে বিদ্যমান আইনি কাঠামো আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপালন না করার প্রবণতাও লক্ষণীয়, যতটুকু পরিপালন করা হয় তা মূলত প্রতীকী অর্থে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চার সাথে কোনো কোনো নির্দেশক সামঞ্জস্যহীন ও অতি-নিয়ন্ত্রণমূলক। অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কার্যকর পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে আইনি শর্তভিত্তিক ব্যবস্থাটি অঙ্কুরেই অর্থ-নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতা (কম্পিটেটিভ ক্লায়েন্টিলিজম) তৈরি করেছে, যা দলগুলোকে ব্যবসায়ীসহ বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য করছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন। দলগুলোর এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থাপনা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-নির্ভও এবং স্বচ্ছতার ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। সেইসাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়।

রাজনৈতিক অর্থায়নে ব্যক্তিনির্ভরতা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত বা উৎসের প্রাধান্য দলগুলোতে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করছে। ফলে রাজনৈতিক দলে বিশেষত প্রভাবশালী দলগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার, কালো টাকা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছে, যা অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা দলীয় অবস্থানকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিজনেস মডেলে পরিণত করছে।

আইনি বাধ্যবাধকতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলে নারীদের অন্তর্ভুক্তিতে বাস্তব অগ্রগতি নেই। নারী নেতা-কর্মীদের অর্ন্তভুক্তির ক্ষেত্রে দলগুলোর অনীহা লক্ষণীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের উপস্থিতি নামমাত্র বা প্রতীকী। দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক চর্চা ও তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ এবং নারী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতির ফলে দলগুলোতে একক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, পরিবারতন্ত্র, কর্তৃত্বপরায়ণতা, অভিজাততন্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিকতা গভীরতর হচ্ছে।

সেইসাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পদক্ষেপের নামে অ্যাডহকভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের বাইরে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ ক্ষমতার অপব্যবহারে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এবং জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতে অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক সহিংসতা স্বাভাবিকতায় পরিণত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য; এই সংস্কারের দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিতে হবে।

সুপারিশ

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

১. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে-
   - আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সহজ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়ন করা
   - আরপিও, ১৯৭২ অনুযায়ী সংসদ সদস্য নির্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিদের কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ/কমিটির সদস্য না করা
   - নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের স্থানীয় সদস্যদের গোপন ভোটে তৈরি প্যানেল থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন চুড়ান্ত করা
   - জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর তিন বছরের দলীয় সদস্যপদ থাকা বাধ্যতামূলক করা
   - সকল দলের আর্থিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা
   - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য মানসম্মত যুগোপযোগী হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা
   - দলের সব পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট সীমার ওপরে আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা
   - আর্থিক প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সাথে সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় পর্যায়ের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা
   - নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যাচাইয়ের ক্ষমতা প্রদান করা
   - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য হালনাগাদকৃত তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা
২. রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে
৩. নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান বিষয়ক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে
৪. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক হিসাব যাচাই ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধি এবং আইনি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
৫. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্মের একটি তালিকা তৈরি এবং তালিকাভুক্ত ফার্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক লেনদেনের নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে

৬. দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আচরণবিধি, আর্থিক নীতিমালা, জেন্ডার নীতি ও শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে
৭. দলের গঠনতন্ত্রে কমিটি গঠন ও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ভিত্তিক কাউন্সিল আয়োজন এবং প্রতিটি পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন গোপন ভোটের মাধ্যমে করতে হবে
৮. দলীয় প্রধানের পদসহ নেতৃত্বস্থানীয় পদে একই ব্যক্তি কতদিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে
৯. দলের নেতৃত্ব পর্যায়ে ও নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে
১০. নেতৃত্ব নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী সুস্পষ্ট করতে হবে
১১. দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে
১২. দলে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রতিরোধমূলক যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে
